৩৭ বছরে কত কোটি ছাত্রের ক্ষতি হয়েছে জবাব দেবে কে?

১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তার পর দীর্ঘ ১৯ বছর অগ্রণী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমর্থনে ও এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনের ফলে ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক বাংলা বনধের মাধ্যমে ইংরেজি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার। কিন্তু পাশ-ফেল চালু করেনি। আন্দোলন চলতে থাকে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার রাইট টু এডুকেশন এর অজুহাতে পাশ-ফেল ক্লাস এইট পর্যন্ত তুলে দেয়। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমানের তৃণমূল সরকার উভয়েই পাশ-ফেল তুলে দিয়ে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা প্রশস্ত করে। এভাবে টানা ৩৭ বছর এস ইউ সি আই (সি) বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে এই পাশ-ফেল কেন জরুরি ও কোন স্বার্থে সরকারগুলি চালু করছে না তা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আগামী ১৭ জুলাই অবিলম্বে পাশ-ফেল চালু করার দাবিতে রাজ্যে ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

শিক্ষা দান-শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কতখানি শিখল তা-ই শুধু বোঝা যায় এমন নয়, কতখানি দক্ষতার সঙ্গে পড়ানো হয়েছে এবং তা কতটা ফল দিচ্ছে, তা-ও বোঝা যায়। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সহ নানা ক্ষেত্রে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার জন্য, কিংবা চাকরি পেতে গেলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রচলিত।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি করা হয়, ছাত্ররা পরীক্ষায় ভয় পায়, সেজন্য ফেল করে এবং তাদের ক্ষতি হয়। এ এক অদ্ভুত কথা! ভয় পেলে, ভয়ের কারণ দূর না করে পরীক্ষা তুলে দেওয়ার উদ্ভট যুক্তি হয় পাগল না হয় মতলববাজরা দিতে পারে। বাস্তবে স্কুল-কলেজগুলিতে শয়ে শয়ে শিক্ষক পদ শূন্য পড়ে আছে। সিলেবাস প্রায়শই শেষ হয় না। ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরিগুলির অবস্থা নিতান্তই দুর্দশাগ্রস্ত। ডিপিইপি, সর্বশিক্ষা অভিযান ইত্যাদি নানা গালভরা সরকারি প্রকল্প সত্ত্বেও শিক্ষার পরিকাঠামো দ্রুত ভেঙে পড়ছে। এই আঘাত প্রধানত সরকারি স্কুলগুলিতেই পড়েছে। আবার সরকারের শিক্ষানীতির খড়্গ পড়েছে এই স্কুলগুলির উপরেই। এরা পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সরকারি ফরমান মানতে বাধ্য, বেসরকারি স্কুলের সেই বাধ্যতা নেই। ফলে সরকারের এই শিক্ষানীতির দ্বারা দু'রকম ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যা দু'ধরনের নাগরিক— পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা ও অটোমেটিক পাশ করা নাগরিক— সৃষ্টি করার পথ তৈরি করে দিল। শেষোক্তরা স্বভাবতই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে বিবেচিত।

পরীক্ষা ব্যবস্থা তথা পাশ-ফেল প্রথা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বোঝার উপায় নেই তারা কতটুকু শিখতে পারল, তাদের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলোই বা কী, যা তাদের সংশোধন করতে হবে। বছরের পর বছর পরের ক্লাসে প্রোমোশন নিশ্চিত হওয়ার ফলে পড়াশোনা তাদের কাছে অর্থহীন ছেলেখেলার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, নিজেদের মান উন্নত করার জন্য তাদের উদ্যোগও মার খায়। শিক্ষকদেরও বোঝার উপায় থাকে না, ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পড়ানো কতখানি গ্রহণ করতে পারল, কতটুকু পারল না, কিংবা কোন ছাত্রদের আরও যত্ন দরকার, কাদেরই বা আরও মেধার পরিচয় দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতি একজন শিক্ষকের উদ্যম নষ্ট করার পক্ষে শুধু যথেষ্ট তাই নয়, বছরের পর বছর ধরে প্রতি দিন এইরকম অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে রীতিমতো যন্ত্রণাদায়ক। পাশাপাশি, শিক্ষকদের পড়ানোর বাইরে নানা ধরনের কাজে নিযুক্ত করা এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বাজারকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি চারিয়ে দেওয়ার ফলে উভয়ের মধ্যেই পড়াশোনা সম্পর্কে উদাসীনতা, অদক্ষতা, হতাশা ও আন্তরিকতার অভাব সৃষ্টি হয়। ফলে পড়ানো চলতে থাকে, ছাত্রছাত্রীরাও ক্লাসে নিয়মমাফিক আসে যায়, কিন্তু যা থাকলে পড়া ও পড়ানোর কাজটি যথার্থই অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমুখী হয়, উভয় পক্ষের কারও মধ্যেই সেই গভীরতা, উদ্দেশ্যমুখীনতা ও আন্তরিকতার অস্তিত্ব থাকে না।

ফলস্বরূপ গোটা দেশ জুড়ে স্কুলশিক্ষার মান যে ভয়ঙ্করভাবে নেমে গেছে, শাসকরাও আজ আর তা অস্বীকার করতে পারছে না।

পাশ-ফেল প্রথার প্রয়োজনীয়তা এবার একটু দেখে নেওয়া যাক। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোনও শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরিমাপ (সহজ ভাষায় একেই আমরা পরীক্ষা বলে থাকি) করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, তার শিক্ষার মান একটি ন্যূনতম ধাপও পার হতে পারেনি, তবে তো এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, সেই নির্দিষ্ট সময়ে তার যে শিক্ষা অর্জন করার কথা ছিল তা করতে সে ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাকে আরও একবার সেই শিক্ষা অর্জনের সুযোগ দেওয়াটাই তো বাঞ্ছনীয়। নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধি কী বলে? এক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জিত না হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার্থীকে পরের ধাপে এগিয়ে দেওয়া তো অনেকটা কোনও বাড়ির ভিতটাই তৈরি না করে তিনতলা তৈরিতে হাত দেওয়ার মতো। এক্ষেত্রে তাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করে আগের শ্রেণিতে রেখে দেওয়ার অর্থ হল বাস্তবে তার শিক্ষার অধিকার হরণ করা নয়, শিক্ষার অধিকার রক্ষা, সেই অধিকারকে প্রকৃত স্বীকৃতিদান। পাশাপাশি এই ব্যর্থতা আরও কতগুলি শিক্ষা দেবে শিক্ষার্থীকে যেগুলি জীবনের পথে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সে বুঝতে শিখবে, জীবনের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেখানে অনেক বাধা অতিক্রম করেই কিছু অর্জন করতে হয়। পাশাপাশি ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা তাকে সাফল্য অর্জনের পথ খোঁজা ও ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ের বিষয়েও প্রাণিত করবে। অবশ্যই এজন্য একটা সহানুভূতিশীল পরিবেশ তার দরকার। বিদ্যালয়ে সে পরিবেশ তার প্রাপ্য। কোথাও এই পরিবেশ নেই বলে যদি সরকার মনে করে, তাহলে তা গড়ে দেওয়ার দায়িত্বটাও ছিল তাদেরই। কিন্তু সরকার সে পথে হাঁটেনি।

আরও একটি কারণে পাশ-ফেল প্রথা আমাদের দেশে অত্যন্ত কার্যকরী। যদি নিজেদের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা ভুলে না গিয়ে থাকি, তবে প্রায় সকলেই মনে করতে পারব, আমরা অধিকাংশই পরীক্ষার ঠিক আগে অন্য সময়ের তুলনায় অন্তত কিছু বেশি জোর দিয়ে পড়াশোনা করতাম। পরীক্ষার ভয় এক্ষেত্রে পড়াশোনার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করত। এ নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার সময় নিতান্ত অমনোযোগী ছাত্রও যে কিছুটা পড়াশোনা করে থাকে, এই সত্য অস্বীকার করা যায় কি? তা ছাড়া এখানে মাথায় রাখতে হবে দু'টি প্রশ্ন। আমরা এখানে বিদ্যালয় ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা করছি, যারা যুক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝবার মতো পরিণতি অবশ্যই অর্জন করেনি, তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাপ আখেরে তাদেরই লাভ ঘটায়। তা ছাড়া গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে পড়াশোনা দেখিয়ে দেওয়ার, পরামর্শ দেওয়ার, দেখাশোনা করার যথেষ্টই অভাব, পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার ভয় যে তাদেরও ন্যূনতম শিক্ষাটুকু অর্জনের জন্য কিছুটা মনোযোগ আদায় করে দেয়, তাদের পরিবারের বড়রাও অন্তত এই সময় একটু পড়ার খোঁজ নেয়, সে সত্য অস্বীকার করার মানে বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা ছাড়া কিছু নয়।

রাজ্যের মানুষ আশা করেছিল তৃণমূল সরকার সর্বস্তরের মানুষের মতকে সম্মান জানিয়ে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তন করবে। কিন্তু পরিহাস হল, মালিক শ্রেণির ইচ্ছা ও নির্দেশকে শিরোধার্য করে তারাও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এই সিদ্ধান্ত শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং শিক্ষা নিয়ে ব্যবসাকেই আরও পোক্ত করে তুলছে। সাধারণ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের সর্বনাশ করছে। এই সর্বনাশের হাত থেকে শিক্ষা তথা বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করতেই ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিণতিতে ১৭ জুলাই রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষ নিশ্চয় এই ধর্মঘটকে সফল করে তুলে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করবে অবিলম্বে পাশ-ফেল চালু করতে।

প্রয়োজনীয় পরীক্ষাব্যবস্থায় কুঠারাঘাত করা হয়েছে

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার

পরীক্ষায় পাশ-ফেল প্রথার বিরোধিতা করে যাঁরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই প্রথা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁদের মূল যুক্তি দুটি— ১) ফেল করলে পরীক্ষার্থীর নরম মনে আঘাত লাগে এবং আত্মহত্যার পথানুগামী হয় অনেকেই। ২) পড়াশুনায় নির্মল আনন্দলাভ বাধাপ্রাপ্ত হয় পাশ-ফেল প্রথার কঠিন বাধা যে শিশুদের

পেরোতে হয়। যাঁরা এমন যুক্তিতে বিশ্বাসী তাঁরা আসলে 'ফেল' শব্দটির উপর প্রয়োজনাধিক মনোযোগ দেন এবং যে বিষয়টি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সেটি হল, ফেল করা শিক্ষার্থীদের প্রতি গুরুকুল এবং অভিভাবক গোষ্ঠীর সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর আচরণই শিক্ষার্থীদের (ফেল করা) মনোবল নষ্ট করে দেয়। পাশ-ফেল প্রথা নয়, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে যত নষ্টের মূলে অবস্থান করছেন। অথচ দোষ গিয়ে পড়ছে পাশ-ফেল প্রথার উপর এবং সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল অবিবেচকের মতো প্রয়োজনীয় পরীক্ষাব্যবস্থায় কুঠারাঘাত হেনে।

পাশ-ফেল প্রথা আসলে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে পাঠ্যবিষয় শিখতে পারল কিনা তা মূল্যায়ন করার মাধ্যম মাত্র। 'পাশ'-এর অর্থ সফলতা আর 'ফেল'-এর অর্থ অ-সফলতা। যে শিশু অসফল হবে তার প্রতি শিক্ষক ও অভিভাবকদের উচিত অধিক যত্নবান ও স্নেহশীল হওয়া। 'ফেল' শব্দটি ব্যবহার না করলেও চলে। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখতে পারল তার মূল্যায়ন করাই হল পরীক্ষাগ্রহণ প্রথা— এ কথা বললেই তো সমস্যা মিটে যায়।

অনাবশ্যক বিতর্ক তোলার প্রেক্ষিত কি এভাবে এড়ানো যায় না?

স্মারকলিপি

শত্রুতা নেই তোমাদের সাথে যারা আছো সরকারে
শুধু চাই সব সন্তান যেন মানুষ হতে পারে।
ধাপে ধাপে আজ শিক্ষার যা দাঁড়িয়েছে হালচাল
অপশিক্ষার প্রত্যাঘাতে কেউ বাঁচবে না কাল।
শিক্ষা নিয়ে প্রবঞ্চনা— এটা সভ্যতা নয়
মানুষের মতো বাঁচার জন্য মানুষ হতে হয়।
শিক্ষা দেয় সে মনুষ্যত্ব, শিক্ষা দেয় সে শক্তি
অশিক্ষা দেয় পশুর জীবন, প্রবৃত্তি-আসক্তি।
আইনের জোরে সব ছাত্রকে শুধুই করালে পাশ
শিক্ষার কোনও থাকে না মানে, পুরোটাই পরিহাস।
শিক্ষা মানে তো শিক্ষার্থীকে জীবন-যোগ্য করা,
আরও সুন্দর সমাজ গড়তে ছেলে-মেয়েদের গড়া।
অথচ, শেখা হোক বা না হোক, তুলে দিচ্ছ ক্লাসে
ফাঁকি দিচ্ছ, আঘাত করছ বাবা-মা'র বিশ্বাসে।
ভুয়ো-পাশ কেউ চাই না, সঠিক মূল্যায়ন-টা চাই
কী ভাবে হবে, প্রহসন হয় যদি পরীক্ষাটাই?
এ-ভাবে ছয় আর চৌতিরিশে চারটে দশক হোলো
এবার তোমার অন্ধ মনের বন্ধ দরজা খোলো।
সর্বনাশ যা হবার হয়েছে, আর তা দিও না বাড়তে
শিক্ষা কোনও দলের তো নয়, ওটা সবার স্বার্থে।

আবেদন শোনো, আমরা সকলে বলছি অকপটে,
নয়তো যেতে বাধ্য হব আগামী ধর্মঘটে।

এমন অসংখ্য কবিতা এখন দেওয়ালে, নানা সোস্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে, যার একটি পাঠিয়েছেন গণদাবীর জনৈক পাঠক

পাশ-ফেল
সর্বনাশ রুখতে এখনই চালু করা দরকার

১৯৭৯ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল ও ইংরেজি ভাষা জোর করে তুলে দিয়ে

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়ে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সেদিন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানুরাগী মানুষের সাথে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা প্রতিবাদ-আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সরকার বাধ্য হয়েছিল ইংরেজি ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু পাশ-ফেল চালুর দাবি মানেনি। গত ৩৭ বছর ধরে রাজ্যের কয়েক কোটি ছাত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা জানি রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখিতভাবে পাশ-ফেল চালুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন অথচ আজও সেই মত রাজ্য কার্যকর করেননি। রাজ্যের গরিব ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বনাশ রুখতে এখনই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করা দরকার।

বিশ্বজিৎ মিত্র,
সাধারণ সম্পাদক
শিক্ষক ও শিক্ষকাকর্মী সমিতি

পাশ-ফেল ব্যবস্থার পজিটিভ দিক অনেক

পাশ-ফেল ব্যবস্থার অনেকগুলি পজিটিভ দিক আছে। প্রথমত এতে শিক্ষার মান বাড়ে। দ্বিতীয়ত, ডিগ্রির সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকে। তৃতীয়ত, অকেজো ডিগ্রিধারীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। চতুর্থত, স্কুলে গেলে কিছু পড়াশোনা করতে হয় এ ধারণা তৈরি হয়। পঞ্চমত, প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ষষ্ঠত, ভাল ছাত্ররা উৎসাহিত হয়। সপ্তমত, অভিভাবকদেরও সচেতনতা বাড়ে। অষ্টমত, শিক্ষার প্রতি সমাজের সকল স্তরে সম্মান ও শ্রদ্ধা বাড়ে। নবমত, পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের উন্নতি ঘটাতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব বাড়ে।

শুধু শিক্ষা নয়, যে কোনও কাজের ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা বাঞ্ছনীয়। প্রতিযোগিতার জন্য পাশ-ফেল-এর সীমারেখাও দরকার। মেধার উৎকর্ষ বৃদ্ধি তবেই সম্ভব। মেধাবী না হলেও পাশ করার মতো দক্ষতা বা মেধা অধিকাংশ ছেলেমেয়ের আছে। তাই পাশ-ফেল ব্যবস্থা থাকুক। তা রেখেও কী ভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় সেই চিন্তা করা জরুরি।

প্রদ্যোত পালুই
এই সময় পত্রিকা থেকে। ১৪ জুন ২০১৭